দৈনিক সমকাল

13 JUL 2017

আবদুল হককে জনতা ব্যাংক পর্ষদের শুভেচ্ছা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় শেখ আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ মালিক চৌধুরী, একে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানী সচিব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন

দৈনিক ভোরের কাগজ 13 JUL 2017

পরিচালক মো. আবদুল হককে জনতা ব্যাংক পর্ষদের শুভেচ্ছা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোকাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

1 3 JUL 2017

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মোঃ আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভোরের পাতা

মোঃ আবদুল হককে জনতা ব্যাংক পর্ষদের শুভেচ্ছা

জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মোঃ আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও এ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানী সচিব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। -বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

Janata Bank acting chairman Manik Chandra Dey hands over a bouquet to newly joined director of the bank Md Abdul Haque at a ceremony held in Dhaka recently. Bank's chief executive officer and managing director Md Abdus Salam was also present, among others. — New Age photo

13 JUL 2017

Janata Bank board of directors acting Chairman Manik Chandra Dey presents a banquet to the newly-appointed director of the bank Md Abdul Haque at a function in the capital on Tuesday.

1 3 JUL 2017

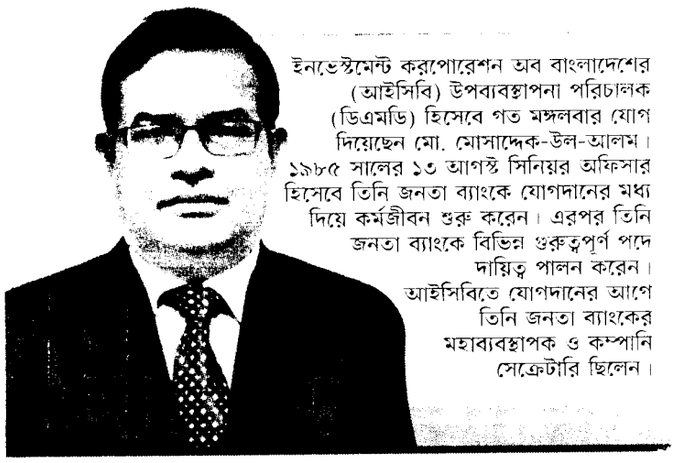

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে গত মঙ্গলবার যোগ দিয়েছেন মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম। ১৯৮৫ সালের ১৩ আগস্ট সিনিয়র অফিসার হিসেবে তিনি জনতা ব্যাংকে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি জনতা ব্যাংকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। আইসিবিতে যোগদানের আগে তিনি জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও কম্পানি সেক্রেটারি ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক সমকাল

তারিখ : 13 JUL 2017

মোসাদ্দেক আলম আইসিবির নতুন ডিএমডি

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশে (আইসিবি) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম। তিনি ১৯৮৫ সালের ১৩ আগস্ট সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ওই ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ পদোন্নতির আগে তিনি জনতা ব্যাংকে জিএম ও কোম্পানি সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অভিজ্ঞ এ ব্যাংকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ : 13 JUL 2017

ডিএমডি হলেন ১২ জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাষ্ট্র মালিকানার বিভিন্ন ব্যাংকের ১২ জন মহাব্যবস্থাপককে (জিএম) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বুধবার তাঁদের পদোন্নতির আদেশ জারি করেছে মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। পদোন্নতি পাওয়া ডিএমডিদের কয়েকজনকে একই সঙ্গে বদলিও করা হয়েছে। রূপালী ব্যাংকের জিএম আবদুল মজিদ শেখ, বিষ্ণুপদ চৌধুরীকে ডিএমডি করে একই ব্যাংকে রাখা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের জিএম সৈয়দ আশরাফ উল আলমকে ডিএমডি করে একই ব্যাংকে ও জনতা ব্যাংকের জিএম ড. মো. ফরজ আলী এফ এফকে ডিএমডি করে একই ব্যাংকে রাখা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের জিএম তাজরিনা ফেরদৌসী এবং রূপালী ব্যাংকের জিএম মো. নুরুজ্জামানকে ডিএমডি করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিডিবিএলের জিএম এ কে এম হামিদুর রহমানকে একই ব্যাংকে ডিএমডি করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের জিএম কাজী আলমগীরকে ডিএমডি করে কর্মসংস্থান ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, অগ্রণী ব্যাংকের জিএম পঙ্কজ রায় চৌধুরীকে বিডিবিএলের ডিএমডি, অগ্রণী ব্যাংকের জিএম মো. ইউসুফ আলীকে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি, অগ্রণী ব্যাংকের জিএম মো. শওকত ইসলামকে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি এবং জনতা ব্যাংকের জিএম মো. মোসাদ্দেক-উল-আলমকে আইসিবির ডিএমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

The New Age

13 JUL 2017

12 DMDs appointed at 7 state-owned banks

Staff Correspondent

THE government has appointed 12 deputy managing directors at seven state-run banks and Investment Corporation of Bangladesh.

The finance ministry issued a circular on Tuesday in this regard giving promotion to the 12 officials from their earlier posts of general manager.

According to the circular, the ministry gave promotion to Abdul Mazid Sheikh and Bishnu Pada Choudhury for the DMD post of Rupali Bank, Syed Ashraful Alam, Yusuf Ali, Shawkat Islam for Sonali Bank, Foroz Ali for Janata Bank while Tazrina Ferdous and Nruzzaman for Bangladesh Krishi Bank, Kazi Alamgir for Karmasangsthan Bank, Mosaddek-ul- Alam for ICB, and Pankaj Roy Chowdhury and AKM

Continued on B2 Col. 4

12 DMDs

Continued from B1

Hamidur Rahman were appointed for BDBL.

The newly appointed five DMDs were posted at their same banks and seven were re-assigned to other banks.

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ : 13 JUL 2017

যেভাবে লুট হয় ব্যাংকের টাকা

পরিচালকরা আত্মীয়-স্বজনের নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না, নামসর্বস্ব কোম্পানিকে কমিশনের বিনিময়ে ঋণ, জাল দলিল ভুয়া এফডিআর মর্টগেজ দেখানো হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত নয়, বেসরকারি ব্যাংক থেকেও ঋণ নিয়ে তা পুরোপুরি মেরে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে ওই টাকা আত্মসাৎ করছেন ব্যাংকের পরিচালকরা। এমনকি ১৮ বছর বয়সী তরুণী থেকে শুরু করে পরিচালকের কাজের লোক, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শির নামে ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ করছেন না। বছরের পর বছর অনাদায়ী দেখিয়ে পরবর্তীতে তা খেলাপি ঋণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এ ছাড়া ভুয়া কাগজপত্র, জাল দলিল, ভুয়া এফডিআর মর্টগেজ হিসেবে দেখিয়ে যাচাই-বাছাই না করে আবেদনকারীদের বড় অঙ্কের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঋণের বিপরীতে রাখা জামানতের সম্পত্তিতে সাইনবোর্ড লাগানোর নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এভাবেই বিসমিল্লাহ গ্রুপ এবং হলমার্কের মতো ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি এখন বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও এ ধরনের অস্বাভাবিক ঋণ দেওয়ার বহু ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, নব্য ব্যবসায়ী, কোনো ধরনের বিনিয়োগ ছাড়া রাতারাতি উদ্যোক্তা বনে যাওয়া এবং নামসর্বস্ব গ্রুপ অব কোম্পানিজের নামেও দেদার ঋণ দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। যার বেশির ভাগই পরর্তীতে অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ঋণ নেওয়ার সময় ঋণের আবেদনকারীরা ব্যাংকের পরিচালক এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মোটা অঙ্কের কমিশন দিয়ে তা বোর্ডে অনুমোদন করিয়ে নিচ্ছেন। ফলে ওই ঋণ পরিশোধে তেমন কোনো তাগিদ দেখা যায় না ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকির অভাব, সময় মতো অডিট না হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ অডিট ঠিকমতো না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এতে দেশের পুরো ব্যাংক খাত মারাত্মক ঝুঁকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব লুটপাটের ঘটনায় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি খাতের অন্তত পাঁচটি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে তাতেও থামছে না ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা লুটপাট।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর **এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪**

যেভাবে লুট হয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ঋণখেলাপিদের একটা বড় অংশই আছে, যাদের ঋণ দেওয়ার সময় সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়নি। ঋণগ্রহীতাদের সম্পদ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কোনো নিয়ম মানা হয়নি। এর ফলে খেলাপি ঋণ বেড়েছে। আর যারা শীর্ষ খেলাপি তারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা ব্যাংকের পরিচালক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে থাকেন। ফলে এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। আর ব্যাংকগুলোর নিজেদের তদারকি ব্যবস্থাও শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে পরিচালকদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভুয়া দলিল, ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পর তা পরিশোধ করছেন না গ্রাহক। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়ার জন্য ভুয়া টিআইএন নম্বরও খোলা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংককে দেওয়া কাগজপত্রের ঠিকানা অনুযায়ী গ্রাহকের খোঁজ পায় না ব্যাংক। খোঁজ পেলেও আইনি জটিলতায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কারও কারও বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করলেও তা ঝুলে থাকছে বছরের পর বছর। কিন্তু এর কোনো সমাধান হচ্ছে না। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বাধ্য হয়ে ঋণের কিস্তি না পেয়ে নির্দিষ্ট সময় পর ওই সব ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত করছে। ফলে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ ব্যাংকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে। জানা গেছে, প্রথম সারির একটি বেসরকারি ব্যাংকে ৩৪৮ কোটি টাকা ঋণ কেলেঙ্কারি ও আত্মসাতের ঘটনায় ওই ব্যাংকের এমডি, ডিএমডিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দুদকের মামলায় আসামি করা হয়েছে। ঈদের পর থেকে তারা আর অফিসেও আসছেন না। এতে ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাংকটিতে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে গত মে মাসে পর্যবেক্ষক বসায় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকটির ঋণশৃঙ্খলাও ভেঙে পড়েছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক তদন্তে উঠে এসেছে। ব্যাংকটির ঋণ যাচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপের কাছে, যা আদায়ও হচ্ছে না। এর পরও নতুন ঋণ পাচ্ছে ওইসব গ্রুপ অব কোম্পানি। এ ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রেও পরিচালকরা অনিয়ম করেছেন বলে দুদকের তদন্তে পাওয়া গেছে। তবু কোনো পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি। নতুন প্রজন্মের আরেকটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান খোদ তার ১৮ বছর বয়সী ভাইঝিকে নিজের কোম্পানির পরিচালক বানিয়ে ভুয়া টিআইএন নম্বর দিয়ে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকার ঋণ বাগিয়ে নিয়েছেন। এমন কি এই ঋণের জন্য যে সম্পদ জামানত নেওয়া হয় তারও অতিমূল্যায়ন দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে ওই অনিয়ম ধরা পড়েছে। এদিকে একটি প্রতারক চক্র কখনো কখনো ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে ব্যাংক ঋণ নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশেও ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি অতিমূল্যায়িত করে, ভুয়া এলসি খুলে কিংবা জাল সঞ্চয়পত্র ও এফডিআর বন্ধক রাখার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশের ব্যাংকিং খাতে বিপুল পরিমাণ ঋণখেলাপি সৃষ্টি হয়েছে। গত সোমবার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে অন্তত ১০০ ঋণ খেলাপির তালিকা প্রকাশ করেন, যারা ঋণ নিয়েও পরিশোধ করছেন না। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ব্যাংক খাতের শতাধিক ঋণগ্রহীতার হদিস মিলছে না। নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে তারা গা-ঢাকা দিয়েছেন। অনেকে আবার বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এসব ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো। একদিকে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে তাদের মর্টগেজ সংক্রান্ত কাগজপত্রও ভুয়া। এই প্রতারক ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক খাত থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে বলে জানা গেছে। এর সিংহভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ কয়েকটি প্রথম সারির বেসরকারি ব্যাংকের টাকা। শুধু তাই নয়, নতুন ব্যাংকগুলোতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে একাধিক। এই প্রতারকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অসৎ কর্মকর্তাদেরও যোগসাজশ রয়েছে বলে মনে করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও এদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিদর্শন প্রতিবেদনে এদের ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই দেশের ব্যাংকিং খাতে সীমাহীন দুর্নীতি আর লুটপাটের ঘটনা ঘটছে। যা এ খাতকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ব্যাংকিং খাতের ভিতরে সুশাসন না থাকা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাযথভাবে দেখভাল না করা ও অর্থ বিভাগের তদারকির ঘাটতি রয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু এগুলোর বাইরে সবচেয়ে বড় কথা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। রাজনৈতিক সিগন্যাল না থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতারও প্রয়োগ করা যায় না।

দৈনিক সমকাল 13 JUL 201[illegible]

শীর্ষ খেলাপির বেশিরভাগই সরকারি ব্যাংকের

শেখ আবদুল্লাহ

[illegible] দেশের শীর্ষ ১০০ [illegible] নের যে তালিকা প্রকাশ [illegible] বেশিরভাগই সরকারি [illegible] বছরের পর বছর চলতে [illegible] অনিয়ম ও দুর্নীতি, ঋণ বিতরণে [illegible] প্রভাব, সুশাসনের অভাব, [illegible] নিয়ন্ত্রণ কম থাকাসহ নানা [illegible] ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের [illegible] হয়েছে। ব্যাংক খাতে [illegible] পরিমাণও বেড়েছে [illegible] ব্যাংকগুলোর কারণে।

[illegible] আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে দেশের শীর্ষ [illegible] প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেন। তালিকা ধরে অন্তত [illegible] প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে কমপক্ষে ৫২টি প্রতিষ্ঠান [illegible] গ্রাহক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু [illegible] একাধিক সরকারি ব্যাংকে খেলাপি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান [illegible] পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকেও খেলাপি।

[illegible] বিশ্লেষক ও ব্যাংকাররা বলছেন, অর্থমন্ত্রী যে [illegible] লিকা [illegible] বর্তমানে কাগজে-কলমে খেলাপি। কিন্তু আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন এবং আদালতে রিট করে খেলাপি তালিকার বাইরে রয়েছেন। এ ছাড়া ব্যাংকগুলো অনেক প্রতিষ্ঠানের ঋণ অবলোপন করে হিসাবের খাতার বাইরে রেখেছে। এগুলো বিবেচনায় নিলে খেলাপি ঋণের চিত্র আরও ভয়াবহ হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রধান কারণ

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সমকালকে বলেন, সরকারি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ ক্ষমতা না থাকা এসব ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এ ছাড়া অদক্ষ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পরিচালনা পর্ষদে নিয়োগ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অপশক্তির কারণেই শীর্ষ খেলাপির অধিকাংশই সরকারি ব্যাংকে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করেন তিনি।

জানতে চাইলে সরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ সমকালকে বলেন, শীর্ষ খেলাপিদের একটি অংশ সরকারি ব্যাংকে

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শীর্ষ খেলাপির বেশিরভাগই সরকারি ব্যাংকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] এসব ব্যাংকের [illegible] ও আমানতের পরিমাণ অন্য ব্যাংকের [illegible] বেশি হওয়ায় এমন হয়েছে। তবে খেলাপিদের থেকে ঋণ আদায়ে তৎপরতা [illegible]। এ জন্য সামাজিকভাবে খেলাপিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার [illegible] এসেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শীর্ষ খেলাপির তালিকায় থাকা খেলাপি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের [illegible] গ্রুপের [illegible] তেল [illegible] প্রতিষ্ঠান ইলিয়াছ ব্রাদার্স অগ্রণী [illegible] বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে পরিশোধ করছে না। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি ১০টি ব্যাংক থেকে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, যার প্রায় পুরোটাই খেলাপি। ব্যবসায়ী [illegible] সুলতানের মালিকানাধীন টিআর ট্রাভেলসের সহযোগী [illegible] ট্রেডিং হাউস বিডিবিএল ও কমার্স ব্যাংকের গ্রাহক।

শীর্ষ খেলাপিদের তালিকায় রয়েছে সোনালী ব্যাংকের আলোচিত ঋণ কেলেঙ্কারি হলমার্ক গ্রুপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম। হলমার্ক গ্রুপ সোনালী ব্যাংক থেকে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তারাও এ কাজে সহযোগিতা করেছেন। এই জালিয়াতি [illegible] ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক [illegible] অভিযোগ রয়েছে। তালিকায় রয়েছে সোনালী ব্যাংকের টি অ্যান্ড ব্রাদার্স নামের আরেক আলোচিত প্রতিষ্ঠান। আরেক আলোচিত ঋণ কেলেঙ্কারির হোতা বিসমিল্লাহ গ্রুপ জনতা ব্যাংকের গ্রাহক। বিসমিল্লাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আলফা কম্পোজিট টাওয়েলস জনতা ব্যাংকের গ্রাহক। জনতা ব্যাংকের আরেক খেলাপি প্রতিষ্ঠান শাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েল রয়েছে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তালিকায়।

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের মোস্তফা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এম এম ভেজিটেবল অয়েল অগ্রণী, জনতা, বিডিবিএল, কমার্স, জনতা, রূপালী ব্যাংক থেকে কয়েকশ' কোটি টাকা নিয়ে এখন খেলাপি। আরও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকেও এ প্রতিষ্ঠানটি খেলাপি। দীর্ঘদিন ধরে খেলাপি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলোচিত নাম সালেহ কার্পেট। অগ্রণী, বিডিবিএল, সোনালী ও জনতা ব্যাংকের প্রায় ৩০০ কোটি টাকা আটকা পড়েছে এ প্রতিষ্ঠানের কাছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের প্রতিষ্ঠান ওয়ান ডেনিমসও জনতা ব্যাংকের গ্রাহক।

ওয়ালমার্ট ফ্যাশন সোনালী ব্যাংকের পৌনে দুইশ' কোটি টাকার খেলাপি। এমবিএ গার্মেন্টস জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় একই পরিমাণ অর্থ নিয়ে খেলাপি। ম্যাক শিপ বিল্ডার্স অগ্রণী ব্যাংকের ১৬০ কোটি টাকার খেলাপি প্রতিষ্ঠান। হিন্দুল ওয়ালি টেক্সটাইল জনতা ব্যাংকের দেড়শ' কোটি টাকা ফেরত দিচ্ছে না। মুন বাংলাদেশ অগ্রণী ব্যাংকের দেড়শ' কোটি টাকা নিয়ে এক টাকাও পরিশোধ করেনি। এ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণে কোনো ধরনের নিয়ম মানেনি অগ্রণী ব্যাংক। যে কারণে অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদকে অপসারণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

তালিকায় থাকা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ রূপালী ব্যাংকের খেলাপি। জসিম আহমেদের মালিকানাধীন শফিপুরের ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিক্স সোনালী ব্যাংকের দীর্ঘদিনের খেলাপি। রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের আলোচিত ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠান টেকনো ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মা টেক্স, প্রফিউশন টেক্সটাইল, অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, নিউ অটো ডিফাইন ও ডেল্টা সিস্টেম এসেছে শীর্ষ ১০০ খেলাপির তালিকায়। অর্জন কার্পেট অ্যান্ড জুট ওয়েভিং সোনালী, বিডিবিএল, জনতা থেকে ১২৫ কোটি টাকার ঋণ নিয়ে খেলাপি। জাতীয় পার্টি নেতা শওকত চৌধুরীর মালিকানাধীন নীলফামারীর সৈয়দপুরের বিসিক শিল্পনগরীর যমুনা অ্যাগ্রো কেমিক্যালস কমার্স ব্যাংকের খেলাপি।

জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিংয়ের রূপালী ব্যাংকে ১০০ কোটি টাকার বেশি খেলাপি। বেনেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজও রূপালী ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিআইএফএফএল থেকে ঋণ নিয়ে অন্য খাতে বিনিয়োগ করে আলোচিত প্রতিষ্ঠান হিলফুল ফুজুল সমাজকল্যাণ সংস্থাও এসেছে শীর্ষ খেলাপির তালিকায়। আসবাবপত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অটবীর কোয়ান্টাম পাওয়ারস সিস্টেমস সরকারি ইডকল থেকে ঋণ নিয়ে খেলাপি। সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন চট্টগ্রামের পটিয়ায় অবস্থিত জাহাজ ও নৌযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড অগ্রণী ব্যাংকের খেলাপি।

চট্টগ্রামের নূরজাহান গ্রুপের মালিকানাধীন জেসমিন ভেজিটেবল ও মেরিন ভেজিটেবল অয়েল এবং চট্টগ্রামভিত্তিক আরেক প্রতিষ্ঠান নূরজাহান সুপার অয়েল অগ্রণী, কমার্স ও সোনালী ব্যাংকের গ্রাহক। খাতুনগঞ্জের জয়নাল আবেদীনের ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল ও ম্যাক শিপ বিল্ডার্স অগ্রণী ব্যাংকের গ্রাহক।

বিএনপির সাবেক এমপি হারুনুর রশিদ খান মুন্নুর মালিকানাধীন মুন্নু ফেবরিক্স বিডিবিএল, সোনালী ব্যাংকের গ্রাহক। সোনালী জুট মিলস সোনালী ব্যাংকের গ্রাহক। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ী মুজাহের হোসেনের কোম্পানি ইয়াসির এন্টারপ্রাইজ রাষ্ট্রায়ত্ত কয়েকটি ব্যাংকের গ্রাহক। চৌধুরী নিটওয়্যারস জনতা ব্যাংকের গাহক। নিউ রাখী টেক্সটাইলস মিলস সোনালী ব্যাংকের গ্রাহক। লাকি শিপ বিল্ডার্স অগ্রণী ব্যাংকের গ্রাহক। ওয়েল টেক্স বেসিকের গ্রাহক। অনিকা এন্টারপ্রাইজ কৃষি ব্যাংকের গ্রাহক।

শীর্ষ খেলাপির তালিকায় বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহকও রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কমপক্ষে ১৫টি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক রয়েছে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তালিকায়। রয়েছে কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকও।

কেয়া গ্রুপকে ঋণ দিয়ে উদ্বেগে তিন ব্যাংক

হাছান আদনান ■

আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আবদুল খালেক পাঠানের মালিকানাধীন কেয়া গ্রুপ। বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে গ্রুপের ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে থাকা গ্রুপের ১৩৩ কোটি টাকার ঋণ আগেই খেলাপি হয়ে গেছে। খেলাপি হওয়ার পথে রয়েছে গ্রুপটির কাছে থাকা পূবালী ব্যাংকের ৫৬৭ কোটি ও ন্যাশনাল ব্যাংকের ২৬৬ কোটি টাকার ঋণও। কেয়া গ্রুপের বিপর্যয়ে ঋণ আদায় নিয়ে উদ্বেগে আছে অর্থায়নকারী এ তিন ব্যাংক।

যদিও আবদুল খালেক পাঠান বলছেন, ব্যাংকগুলোর অসহযোগিতার কারণেই আজকের এ অবস্থা। সংকট কাটাতে ব্যাংকগুলো আরো ঋণ দিলে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে কেয়া কসমেটিকসসহ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

২০১৫ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের সঙ্গে কেয়া নিট কম্পোজিট লিমিটেড, কেয়া স্পিনিং মিলস লিমিটেড, কেয়া কটন মিলস লিমিটেডকে একীভূত করা হয়। কোম্পানিটির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেয়া কসমেটিকসের মোট ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ২৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (লং টার্ম লোন) ৮৩৫ কোটি ৯০ লাখ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ (শর্ট টার্ম লোন) ৪২০ কোটি টাকা। তবে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের চলতি বছরের মার্চ প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোম্পানিটির ব্যাংকঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৬৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা।

আবদুল খালেক পাঠান
চেয়ারম্যান, কেয়া গ্রুপ

কেয়া কসমেটিকসের বড় অংকের ঋণ রয়েছে বেসরকারি পূবালী ব্যাংকে। গত বছরের জুন পর্যন্ত কোম্পানিটির কাছে পূবালী ব্যাংকের ঋণ ছিল ৩৯৭ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ১৮৫ কোটি ৪৩ লাখ ও স্বল্পমেয়াদি ২১২ কোটি টাকা। তবে পূবালী ব্যাংকের ২০১৬ সালের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেয়া গ্রুপের সবক'টি প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাংকটির ঋণের পরিমাণ ৫৬৭ কোটি টাকা। ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা দেয়া হলেও কেয়া গ্রুপ ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে না। আগামী রোববার পূবালী ব্যাংকের পর্ষদের বৈঠকে কেয়া গ্রুপের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে।

পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল হালিম চৌধুরী বলেন, খেলাপির পর্যায়ে চলে গেলেও পূবালী ব্যাংকের পুরো ঋণ নিরাপদ রয়েছে। কেননা কেয়া কসমেটিকসের ৪২ শতাংশ শেয়ার, গুলশানের একটি বাড়ি, কেয়া গ্রুপের পর্যাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি পূবালী ব্যাংকের কাছে জামানত রয়েছে। কেয়া গ্রুপের ঋণের বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত হবে।

তবে পূবালী ব্যাংক কেয়া গ্রুপের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ গ্রুপের কর্ণধার আবদুল খালেক পাঠানের। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, যে পরিমাণ ঋণের জন্য পূবালী ব্যাংকের কাছে কেয়া গ্রুপ সম্পত্তি জামানত দিয়েছে, সে পরিমাণ ঋণ পূবালী ব্যাংক দেয়নি। ব্যাংকটির কাছে জামানত দেয়া গুলশানের বাড়ির দিকে তাদের নজর ছিল। কেয়া গ্রুপের ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যাংকটি কোনো ধরনের সহযোগিতা করেনি। ২০১০ সালে আমার গার্মেন্টসগুলোয় প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের কাজ করা নিয়ে অন্য শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে। ফলে ওই সময় প্রায় ৮০০ কোটি টাকার তৈরি পোশাক কোম্পানির গোডাউনে স্টক হয়ে যায়। পূবালী ব্যাংক সে সময় সহযোগিতা করলে আজকের এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। ব্যাংকটির অসহযোগিতার বিষয়ে সম্প্রতি আমি উকিল নোটিস পাঠিয়েছি। তার উত্তর পেলে পূবালী ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

আবদুল খালেক পাঠানের মালিকানাধীন কেয়া গ্রুপের কাছে বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। ১৩৩ কোটি টাকা এরই মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে

কেয়া কসমেটিকসের সঙ্গে একীভূত তিনটি কোম্পানিতে ২৬৬ কোটি ৮৯ লাখ টাকার মেয়াদি ঋণ রয়েছে বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংকের। এর মধ্যে কেয়া নিট কম্পোজিট লিমিটেডে ৩৫ কোটি ৫৯ লাখ, কেয়া কটন মিলস লিমিটেডে ১৮৮ কোটি ৮০ লাখ ও কেয়া স্পিনিং মিলস লিমিটেডে ৪২ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ রয়েছে ব্যাংকটির। বড় অংকের এ ঋণের প্রায় পুরোটাই বর্তমানে খেলাপির পর্যায়ে চলে গেছে বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিয়ে ব্যাংকের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে কেয়া গ্রুপের কর্ণধার আবদুল খালেক পাঠান এ বিষয়ে বলেন, ন্যাশনাল ব্যাংক কেয়া গ্রুপকে অসহযোগিতা করার কারণে ঋণটি আটকে গেছে। বিষয়টি নিয়ে আমি ন্যাশনাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।

কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের বড় অংকের ঋণ রয়েছে সাউথইস্ট ব্যাংকে। দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদে কোম্পানিটির কাছে ওই সময় পর্যন্ত ব্যাংকটির ঋণের পরিমাণ ৪৫৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। আর সাউথইস্ট ব্যাংকের ২০১৬ সালের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর শেষে কেয়া গ্রুপের সবক'টি কোম্পানির কাছে ব্যাংকটির ঋণের পরিমাণ ৯১২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে ফান্ডেড ঋণ ৩৫১ কোটি ২১ লাখ ও নন-ফান্ডেড ৫৬১ কোটি ৪৫ লাখ

এরপর ›› পৃষ্ঠা

কেয়া গ্রুপকে ঋণ দিয়ে উদ্বেগে

১ম পৃষ্ঠার পর

টাকা। তবে এ ঋণ নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছে সাউথইস্ট ব্যাংক।

সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল হোসেন বলেন, আমাদের ব্যাংকের সঙ্গে কেয়া গ্রুপের লেনদেন স্বাভাবিক রয়েছে। বড় গ্রাহক হিসেবে আবদুল খালেক পাঠানের ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো।

সাউথইস্ট ব্যাংক সম্পর্কেও প্রায় একই বক্তব্য কেয়া গ্রুপের কর্ণধার আবদুল খালেক পাঠানের। তিনি বলেন, সাউথইস্ট ব্যাংকের শীর্ষ ব্যবস্থাপকরা খুবই দক্ষ। আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। পূবালী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মতো আচরণ সাউথইস্ট ব্যাংক করেনি। ব্যাংকটির ১৫০ কোটি টাকা ঋণে কিছুদিন আগে আমি নতুন কিছু মেশিন আমদানি করেছি। এগুলো পুরো উৎপাদনে গেলে সব ব্যাংকের ঋণ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই পরিশোধ করে দিতে পারব।

কেয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠান কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণখেলাপি। ব্যাংকটির শীর্ষ ঋণখেলাপিদের তালিকার দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে কেয়া গ্রুপের কর্ণধার আবদুল খালেক পাঠানের নাম। ব্যাংকটির কারওয়ান বাজার শাখা থেকে ১৩৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দেননি কেয়া গ্রুপের স্বত্বাধিকারী। বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও অর্থ আদায় করতে না পেরে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে কৃষি ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ১৩৪ কোটি ৫৭ লাখ টাকা আদায়ে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত রিট (রিট নং-৬৭৮৯/১৩) চলমান রয়েছে। কৃষি ব্যাংকের এ ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ায় শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় উঠে এসেছে আবদুল খালেক পাঠানের মালিকানাধীন কেয়া ইয়ার্ন লিমিটেডের নাম।

কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, ব্যাংকের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে কেয়া ইয়ার্ন মিলসের স্বত্বাধিকারী আবদুল খালেক পাঠানের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে নতুন করে ২৫০ কোটি টাকার সিন্ডিকেশন ঋণ চেয়েছেন। আমি নিজে তার প্রতিষ্ঠানগুলো দেখে এসেছি। আমি চাই না কেয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাক। কারণ ওই প্রতিষ্ঠানগুলোয় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করছে। অন্যান্য ব্যাংক এগিয়ে এলে কৃষি ব্যাংক এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

তবে কৃষি ব্যাংকের অসযোগিতার কারণেই ঋণটি খেলাপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আবদুল খালেক পাঠান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের আওতায় ঋণটি পুনর্গঠন করার আবেদন জানানো হলেও কৃষি ব্যাংক পুনর্গঠন করেনি। ফলে ঋণটি খেলাপি হয়ে গেছে। ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যমান সংকট থেকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

কেয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠান কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের ঋণ রয়েছে বেসরকারি খাতের ব্যাংক এশিয়া, স্ট্যান্ডার্ড, ডাচ্-বাংলা, সোস্যাল ইসলামী, প্রিমিয়ার, ইউনিয়ন ক্যাপিটাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের। গত বছরের জুন শেষে কোম্পানিটির কাছে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ঋণের স্থিতি ছিল ৭৫ কোটি ১১ লাখ টাকা। একই সময়ে ব্যাংক এশিয়ার ১৫ কোটি ৬১ লাখ, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ১৩ কোটি ৬০ লাখ, প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৮ কোটি ২৩ লাখ ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ২ কোটি ২২ লাখ টাকা ঋণ ছিল কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের কাছে। এছাড়া কোম্পানিটির কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের ১৩ কোটি টাকা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন ক্যাপিটালের ২৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা ঋণ ছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে খালেক গার্মেন্টস অ্যান্ড নিটিং নামে কোম্পানি দিয়ে বস্ত্র খাতের ব্যবসায় নামেন আবদুল খালেক। এর পর একে একে প্রতিষ্ঠা করেন কেয়া নিট কম্পোজিট লিমিটেড, কেয়া স্পিনিং মিলস লিমিটেড, কেয়া কটন মিলস লিমিটেড, কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড, কেয়া ইউরোপ ও কেয়া ইউএসএ, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড, কেয়া এগ্রো প্রসেস, কেয়া পরিবহন, পলি অ্যাডভারটাইজিং ও কেয়া ডেভেলপারস লিমিটেড। এর মধ্যে কেয়া কসমেটিকস ২০০১ সালে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত হয়।

13 JUL 2017

উত্তর মেলেনি অনেক প্রশ্নের

াসান সোহেল

ংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি ঘটনার ১৬ মাস পার হয়েছে। ই সময়ে রিজার্ভ চুরি তদন্তে অর্থ মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত মিটি প্রথমে প্রাথমিক রিপোর্ট, পরে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়। কাধিকবার এই রিপোর্ট প্রকাশের ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী আবুল াল আবদুল মুহিত। কিন্তু ঘোষনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে রিজার্ভ রির রহস্য। অপরদিকে টাকা উদ্ধারেও একাধিকবার আশ্বাস য়া হয় সব টাকা পেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অথচ দীর্ঘ নেও চুরি যাওয়া অর্থের বেশিরভাগ অংশই উদ্ধার হয়নি।

ত্র মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮০০ কোটি কা চুরি হয়েছে ১৬ মাস আগে। দীর্ঘ এ সময়ে উদ্ধার হয়নি শিরভাগ অর্থ। অথচ অর্থ উদ্ধার ও তদন্তের নামে ব্যয় হয়েছে পুল পরিমাণ অর্থ। ঘন্টায় প্রায় ৪০০ ডলার ব্যয়ে ১ হাজার ০০ ঘন্টা তদন্ত করেছে ফায়ার আই নামক একটি সফটওয়্যার তিষ্ঠান। যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাকেশ আস্তানা নামে ভারতীয় ক নাগরিক। কিন্তু এ ব্যয় বহুল তদন্তের ফলাফল কি তা দেশও জানেনা দেশের জনগণ। আবার ফিলিপাইনসহ বিশ্বের ভিন্ন দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের র্মকর্তারাও দফায় দফায় ভ্রমন করেছেন। কিন্তু ১৬ মাসেও চুরি ওয়া অর্থের বেশিরভাগ অংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বের রিজার্ভ চুরির ১৬ মাসেও কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। না গেছে, সুরক্ষিত সুইফট সিস্টেমের সাথে আরটিজিএস মক একটি সফটওয়্যার সংযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতর কে কেউ কেউ অতিউৎসাহী ছিলেন। আরটিজিএস সংযোগের রই রিজার্ভ চুরি হয়। কারা অতিউৎসাহী ছিলেন নতুন এ ফটওয়্যার সুইফটের সাথে সংযোগ দিতে তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। এমনকি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এফবিআই বলেছে-

'রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়' নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়েছে। আর বিষয়টি জানলেও স্বপদেই বহাল আছেন ওই সব কর্মকর্তারা।

উদ্ধার তদন্তে বিপুল অর্থ ব্যয়, ১৬ মাসেও উদ্ধার হয়নি বেশিরভাগ অর্থ

এমনকি রিজার্ভ চুরি তদন্ত সংস্থা সিআইডি বাংলাদেশ ব্যাংকের আট কর্মকর্তাসহ ২০ জনের প্রাথমিক সংশ্লিষ্টতা পায় রিজার্ভ চুরির সাথে। ২০ জনের বাকি ১২ জন ফিলিপাইন, জাপান ও শ্রীলঙ্কার ব্যাংক কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী।

আবার ফিলিপাইনের দৈনিক পত্রিকা ইনকোয়েরার'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি হয়। চুরি হওয়া ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকিং করপোরেশনের জুপিটার শাখায় ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেখান থেকে অর্থের বড় অংশ চলে যায় দেশটির ক্যাসিনোতে (জুয়ার আসরে)। ক্যাসিনোতেও সেই অর্থ ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ আরও ২০ দিন। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারকে আগ থেকে অবহিত করলে চুরি হওয়া অর্থ ফেরত আনা সম্ভব ছিল কী না। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতে, এ অর্থের বেশিরভাগই ফেরত আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু কেন সরকারকে জানানো হলো না, কারা বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরকে ঘটনাটি জানাতে পরামর্শ দিয়েছিল তা আদৌও জানা যায়নি।

এদিকে রিজার্ভ চুরির ঘটনা জানার পর পরই তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমান চুরি যাওয়া অর্থ ফেরত আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে ফিলিপাইনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওই প্রতিনিধি দল কোনো প্রকার সরকারি আদেশ (জিও) ছাড়া কীভাবে বিদেশ ভ্রমণ করে। একই সঙ্গে সেখান থেকে আসার পর এ-সংক্রান্ত কোনো অগ্রগতি প্রতিবেদন কেন দেয়নি এ প্রশ্নের উত্তর আজও পায়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এমনকি এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো উত্তর পায়নি রিজার্ভ চুরির উপর তদন্তে নিয়োজিত সিআইডি কর্মকর্তারাও। সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, সিআইডি কর্মকর্তারা এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তবে সাবেক গভর্নর এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রিজার্ভ চুরির বিষয়টি সাথে সাথে সরকারকে অবহিত করলে হয়তো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হতো। ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, চুরি হওয়া অর্থ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক অবহিত হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ অর্থ চুরির অবহিত হওয়ার পরও অর্থ ফিলিপাইনের ব্যাংকিং সিস্টেমে ছিল দুই দিন (৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি)। এর পর এক টানা বিশ দিন ফিলিফাইনের জুয়ার আসরে অর্থ ঘোরা ফেরা করে। সরকারকে জানালে অর্থ উদ্ধার কীভাবে সম্ভব হতো? এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের

পৃঃ ১১ কঃ ৬

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, যখন চুরি যাওয়া অর্থ ব্যাংকে ছিল তখন সরকারকে জানালে এবং সাথে সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ফ্রীজ বা টাকা উত্তোলন বন্ধ করা যেতো। এরপর জুয়ার আসরে যাওয়ার পরেও সরকারকে অবহিত করলে টাকা উদ্ধার করা সম্ভব ছিল। যেমন, সরকার টু সরকার পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতো। প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে টাকা উদ্ধারের জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা নেয়া যেতো।

কিন্তু এতোগুলো সম্ভাবনা থাকার পরেও কেন বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে আগে ভাগে জনগণের অর্থ উদ্ধারে অবহিত করলো না। এ দায়ে ইতোমধ্যে সরকারের চাপে গভর্নর আতিউর রহমানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আরও দুই ডেপুটি গভর্নর আবুল কাসেম ও নাজনীন সুলতানাকে অপসারণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া পঁদত্যাগ পত্রে ড. আতিউর রহমান নিজেই লিখেছেন, 'চুরি হওয়া ঘটনা পরবর্তী কার্য দিবসেই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কাছে বিষয়টি অবহিত করি এবং অর্থ পুনরুদ্ধার, জড়িত পক্ষগুলো সনাক্ত করবার এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার বিষয়গুলোর দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই।' তার পদত্যাগপত্রের ভাষা দেখে বুঝা যায়, তিনি বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর পরই বিএফআইইউকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু বিএফআইইউ কেন সরকারকে অবহিত করলো না এটাই এখন বড় রহস্যের বিষয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসান এর আগে সাংবাদিকদের জানান, চুরি হয়ে যাওয়া ১০ কোটি ১০ লাখ ডলারের মধ্যে আগেই শ্রীলঙ্কা থেকে ২ কোটি ডলার আমরা পেয়েছি। আর ফিলিপাইন থেকে আরও ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার আমরা হাতে পেয়েছি। বাকি অর্থ ফেরত পেতে আলোচনা অব্যাহত আছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হিসাব থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে সে বছর মার্চের শুরুতে। এরপর ১৫ মার্চ এ ঘটনায় রাজধানীর মতিঝিল থানায় মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আদালতের নির্দেশে ওই মামলার তদন্তভার পেয়ে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে কাজ শুরু করে সিআইডি। একটি অংশ রিজার্ভ চুরির সঙ্গে জড়িত দেশীয় সূত্রগুলো নিয়ে তদন্ত করতে থাকে। আরেকটি অংশ রিজার্ভ চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদেশী সূত্রগুলো নিয়ে কাজ করছে। চুরি যাওয়া অর্থের মধ্যে শ্রীলংকায় প্রবেশ করা ২ কোটি ডলার আগেই ফেরত পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ফিলিপাইনে যাওয়া ৮ কোটি ১০ লাখ ডলারের বড় অংশই এখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। এ অর্থ থেকে এখন পর্যন্ত ফেরত পাওয়া গেছে মাত্র দেড় কোটি ডলার। যদিও সিআইডি ছাড়াও রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনার তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলো পুলিশ সদর দফতর, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)। সবগুলো বিভাগের একটি সমন্বিত টিম রিজার্ভ চুরির এ তদন্ত কাজ চালায়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
[illegible]
[illegible] কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : JUL 2017

লেনদেন ভারসাম্যে বড় ঘাটতি

বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ৪২ শতাংশ

রেজাউল হক কৌশিক

বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (ব্যালান্স অফ পেমেন্ট বা বিওপি) বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) চলতি হিসাবে ২১০ কোটি ৩০ লাখ ডলার ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাপকহারে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। অর্থবছরের প্রথম ১১ মাস শেষে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬৪৫ কোটি ১০ লাখ ডলার। সে হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ২৭৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ৪২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এক মাস আগে অর্থাৎ জুলাই-এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল ৮১৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সে হিসেবে এক মাসের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ১০১ কোটি ৯০ লাখ ডলার। মূলত দেশের আমদানি ব্যয় যেহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে হারে রপ্তানি আয় না বাড়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আমদানি ব্যয় যে হারে বেড়েছে, সে তুলনায় রপ্তানি আয় না বাড়ায় বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এখন আমদানির এ প্রভাব বিনিয়োগে পড়লে অর্থনীতির জন্য দুঃসংবাদ নেই। কিন্তু এই অর্থ পাচার হলে ফল অত্যন্ত খারাপ হবে। কেননা রেমিট্যান্স প্রবাহ অনেক কমে গেছে, যা বৈদেশিক লেনদেনে যে ভারসাম্য ছিল তা আশঙ্কায় ফেলে দিয়েছে।

দেশে রপ্তানি আয় বাড়লেও তা কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় হচ্ছে না। কিন্তু আমদানি ব্যয় বাড়ছে দ্রুতগতিতে। এতে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। আর বাণিজ্য ঘাটতির পাশাপাশি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ধারাবাহিক কমছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। আবার আমদানিজনিত চাপে দেশের ভেতরে বেড়েছে ডলারের চাহিদা। ফলে চাহিদার তুলনায় ডলারের যোগান কমে গেছে। এ কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন ঘটছে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে প্রতি ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে প্রায় এক টাকা। আর এক বছরের ব্যবধানে কমেছে প্রায় ২ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, বর্তমানে প্রতি ডলার বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা ৬০ পয়সায়।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস রেমিট্যান্স। কিন্তু গত অর্থবছর জুড়েই দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ নিম্নমুখী ধারায় ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) হিসাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে প্রায় ১৪ শতাংশ। যদিও ১২ মাসে এই কমার হার ছিল প্রায় সাড়ে ১৪ শতাংশ। এ সময়ে রপ্তানি আয়েও কাঙ্ক্ষিত গতি আসেনি।

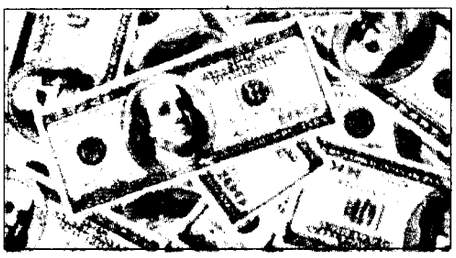

অর্থবছরের ১১ মাসে বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে আয় করেছে তিন হাজার ১০৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল দুই হাজার ৯৯১ কোটি ৯০ লাখ ডলার। সে হিসেবে ১১ মাসে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয় তিন দশমিক ৮০ শতাংশ। তবে গত অর্থবছরের পুরো সময়ে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র এক দশমিক ৬৯ শতাংশ। তবে এ সময়ে আমদানি ব্যয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যহারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ২৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ হাজার ৬৭৩ কোটি ডলার। সে হিসেবে ১১ মাসে আমদানি ব্যয় বেড়েছে ১০ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এই হিসাবে গত অর্থবছরের ১১ মাসে বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে ৯১৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬৪৫ কোটি ১০ লাখ ডলার। উল্লেখ্য, রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় যেটুকু বেশি, তার পার্থক্যই বাণিজ্য ঘাটতি।

রপ্তানি আয়ে ধীরগতি ও প্রবাসী আয় ব্যাপকহারে কমে যাওয়ায় চলতি হিসাবে বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে চলতি হিসাবে ২১০ কোটি ৩০ লাখ ডলার ঘাটতি হয়েছে। অর্থবছরের ১০ মাসের হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭৬ কোটি ডলারের মতো। অথচ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১১ মাসে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ছিল ৩১৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার। এ সময়ে সেবা খাতেও ঘাটতি বেড়েছে। গত অর্থবছরের ১১ মাসে এ ঘাটতি হয়েছে ৩১০ কোটি ডলার। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৪৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। প্রতিবেদন পর্যালোচনা আরও দেখা যায়, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছর জুড়েই চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ছিল। সাধারণত চলতি হিসাবের মাধ্যমে দেশের নিয়মিত বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি বোঝানো হয়। আমদানি-রপ্তানিসহ অন্যান্য নিয়মিত আয়-ব্যয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এখানে উদ্বৃত্ত হলে চলতি লেনদেনের জন্য দেশকে কোনো ঋণ করতে হয় না। আর ঘাটতি থাকলে সরকারকে ঋণ নিয়ে তা পূরণ করতে হয়।

তবে গত অর্থবছরের ১১ মাসে বৈদেশিক লেনদেন সারণির আর্থিক হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থা অনুকূলে রয়েছে। এ সময়ে আর্থিক হিসাবে ৪১৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের উদ্বৃত্ত রয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১১৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। মূলত সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ও শেয়ারবাজারে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাড়াতেই এ অনুকূল অবস্থা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে নিট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই এসেছে ১৬২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১২৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে হিসেবে বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ২৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ সময়ে শেয়ারাবাজারে বিদেশি বিনিয়োগও বেড়েছে। অর্থবছরের ১১ মাসে শেয়ারবাজারে বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে ৩২ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর ফলে সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪১৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

দৈনিক প্রথম আলো

13 JUL 2017

সিবিএ নেতাদের বরখাস্তের নোটিশ

রূপালী ব্যাংক

সিবিএ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও এক অফিস সহকারীকে স্থায়ীভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ব্যাংকটির কর্মচারী ইউনিয়নের (সিবিএ) নেতাদের সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কমিটি। এ ঘটনায় গঠিত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিএ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও এক অফিস সহকারীকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হবে না, তা জানতে চেয়ে তাঁদের সাত দিনের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একজনকে বাধ্যতামূলক অপসারণ ও চার সিবিএ কর্মীকে পদাবনতিসহ রাজধানীর বাইরে বদলির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউর রহমান প্রধান *প্রথম আলোকে* বলেন, গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে, এরপরই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

রূপালী ব্যাংক সূত্র জানায়, গত বছরের ৫ ডিসেম্বর স্থানীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (জিএম), উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) ও সহকারী মহাব্যবস্থাপককে লাঞ্ছিত করেন সিবিএ নেতারা। সিবিএর সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন স্থানীয় শাখায় যোগ দিতে গেলে তাঁদের লাঞ্ছিত করে মোস্তাক-কাবিল নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি। নিজ কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে তাঁদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের নাম হাজিরা তালিকা থেকে মুছে ফেলে ও অনুস্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি সিবিএ সভাপতি খন্দকার মোস্তাক আহাম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক কাবিল হোসেন কাজী ও কাপ্তান বাজার শাখার অফিস সহকারী আরমান মোল্লাকে বরখাস্তের সুপারিশ করে। গত মঙ্গলবার তাঁদের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের সংস্থাপন ও কল্যাণ বিভাগের চালক আবুল কালাম আজাদকে। পাশাপাশি স্থানীয় কার্যালয়ের অফিস সহকারী আনোয়ার হোসেন, ভিজিল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স বিভাগের অফিস সহকারী মনিরুল ইসলাম, শিল্প ঋণ বিভাগের অফিস সহকারী সাব্বির আহমেদ ভূঁইয়াকে পদাবনতিসহ রাজধানীর বাইরে বদলি করা হয়েছে।

সিবিএ সভাপতি খন্দকার মোস্তাক আহাম্মেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই তদন্ত কমিটিতে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধি নেই। ব্যাংকের মানবসম্পদ নীতিমালারও বৈধতা নেই। ফলে এসব শাস্তির কোনো ভিত্তি নেই। আমি চিঠির যথাযথ জবাব দেব এবং নির্দোষ প্রমাণিত হব। ব্যাংকের সিবিএকে ধ্বংস করতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'